দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 MAR 1997
পৃঃ ৬ কলাম ২

শিক্ষানীতিতে চারুকলা

নাজলী লায়লা মনসুর

শিল্পকলার সঙ্গে সংশ্রব মানুষকে করে তোলে পরিশীলিত ও বিবেকবান। শিল্পাচার্য নন্দলালের ভাষায়-

"আজকে পৃথিবীতে যে দুর্দৈব দেখা দিয়েছে তার কারণ মানুষের দেহবুদ্ধির ও স্বার্থবুদ্ধির প্রবলতা। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপায়ে তার সাময়িক যে প্রতিকারই সম্ভব হোক, স্থায়ী ও গভীর প্রতিকার হলো- কেবল প্রাণধারণ ও স্বার্থসাধন এই উভয়ের অতীত যদি কোন প্রেরণা মানুষের থাকে তারই অনুশীলন, তারই সাধনা। সাহিত্য ও শিল্প সেই জগতের জিনিস। মানুষের চিত্তবৃত্তির সংস্কার এতে হয়; ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনে ছন্দ ও সুর তার দান।" (নন্দলাল বসু, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনা বিভাগ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ৭)

দৃশ্য শিল্পের চর্চা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যে কিছু পেশাদার চিত্রকর ও ভাস্কর সৃষ্টি করে নয় বরং সুকুমার শিল্পের প্রতি সমস্ত সমাজের একটি দৃষ্টিভঙ্গিও নির্মাণ করে। একদিকে শিল্পের রসগ্রাহী আগ্রহী দর্শক শ্রেণী তৈরী করে, পাশাপাশি সমাজের সুন্দর ও সুরুচির হাওয়া নিয়ে আসে। সে সমাজ শুধু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্যস্ত ও মানসিক ক্ষুধার নিবৃত্তি বিষয়ে উদাসীন, সে সমাজ উপরে চকচকে হলেও আসলে অন্তঃসারশূন্য। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের এবং বাজার অর্থনীতির বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার কারণে ভোগপণ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা নিজের পছন্দসই দ্রব্যটি ক্রয় করেন। ক্রেতার হয়ত জানা থাকে না যে এই রুচি ও সৌন্দর্যের পিছনে অবদান থাকে একজন চারুশিল্পীর। বর্তমান যুগে চারুকলার ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক— শুধুমাত্র সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি অংশ নং, বরং এর ভূমিকা আর্থ-সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য। দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদকে তুলে ধরার পাশাপাশি-আধুনিক বিশ্বে চারুকলা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রফতানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও কর্মমুখী জনসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সরাসরি অবদান রাখতে পারে। ফলে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে এখন অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিশুদের সৃজন ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করার কাজে চারুকলাকে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। পাঠ্যক্রমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে চারুকলা একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। ফলে উচ্চতর শিক্ষায় একজন শিক্ষার্থী অধিকতর উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয় এবং তার নান্দনিক রুচির মানও হয় উন্নততর। অথচ বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষায় এখনও চারুকলাকে আশানুরূপ গুরুত্ব দেয়া হয় না। এবং পাঠ্যক্রমে এটিকে একটি গুরুত্বহীন বিষয় হিসাবেই স্থান দেয়া হয়। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এটি কোন বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। এর ফলে সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষিত হলেও শৈল্পিক রুচি, সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পকর্মের রসাস্বাদনের ক্ষমতা এবং জাতীয় ঐতিহ্যসচেতনতা তৈরি হয় না। বস্তুত, চারুকলায় প্রশিক্ষিত একজন নাগরিকের পক্ষে বিভিন্নভাবে সামাজিক সুরুচি গঠনে ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব।

অধিক জনগোষ্ঠী এবং সীমিত সম্পদের বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার অন্যতম উপায় মানব সম্পদ উন্নয়ন। চারুকলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের চেয়ে অনেক বেশি আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে- সামান্য পুঁজি নিয়ে ঘরে বসে মৃৎশিল্প, হাতে আঁকা পরিধেয় ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু, স্ক্রিন প্রিন্টের ব্যবহার্য বস্তু, কাগজের মণ্ডের বস্তু, নানান টুকিটাকি হস্তশিল্প, খেলনা ইত্যাদি বানাতে পারে। পণ্যের মোড়ক, লেভেল-লোগো, পোস্টার, বইপুস্তক ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ, প্ল্যান, ডাটা, চার্ট ইত্যাদির কাজ অল্প পুঁজিতে ঘরে বসে করা যায়। এতে তার আত্মকর্মসংস্থান ও উপার্জন হয়, কিছু পণ্য উৎপন্ন হতে পারে। বাংলাদেশে সীমিত চাকরির সুযোগ ও প্রকট বেকারত্বের মধ্যে চারুশিল্পীদের পক্ষে সামান্য পুঁজিতে নিজের দক্ষতাকে ব্যবহার করে, মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব।

সঠিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চারুশিল্পী বর্তমান সমাজে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। দেশে চারুশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত চারুশিল্পী যোগান দিতে পারছে কিনা তা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এই কারণে চারু শিক্ষাদান ব্যবস্থার ব্যাপক ও গভীর পর্যালোচনা এবং পাঠদান ব্যবস্থার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতাসমূহ খতিয়ে দেখা দরকার। সেই সঙ্গে যুগোপযোগী চাহিদার আলোকে পাঠদান ব্যবস্থার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ তুলে ধরা প্রয়োজন।

দেশে এখন একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে চারুকলা শিক্ষার ব্যাপারে কি ধরনের নীতি নির্ধারণ হবে বা চারুকলা শিক্ষার ওপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হবে সে সম্পর্কে কমিশনের ভাবনা-চিন্তা আছে কিনা, জানা নেই। তবে যেহেতু চারুকলা একটি বিশেষ ধরনের প্রায়োগিক ও একই সাথে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি তাই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের উচিত হবে শিক্ষা কমিশনকে এখনই এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের সুপারিশমালা প্রদান করা এবং বাংলাদেশে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঠিক দিকনির্দেশনায় সাহায্য করা।

বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে তা ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষারীতিরই একটি সামান্য পরিবর্ধিত সংস্করণ। চারুকলা সৃজনশীল বিষয় বলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যেই মতানৈক্য রয়েছে। কবিতা বা গল্প লেখা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হয় না, কারণ এখানে কারিগরী সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। কিন্তু চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দরকার। এর প্রধান কারণ হচ্ছে চিত্র রচনা ও ভাস্কর্য নির্মাণের সঙ্গে ব্যাপক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান জড়িত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া এগুলো আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে প্রধানত এর বিভিন্ন শাখার শিল্প নির্মাণের কারিগরী জ্ঞান বিতরণই বোঝায় উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশের ব্যবস্থাও এর মধ্যে থাকতে হবে। কারিগরী জ্ঞান ও সৃজনক্ষমতার বিকাশ- এ দুটোর ভারসাম্যময় একটি ব্যবস্থাই হতে পারে চারুকলা শিক্ষার আদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

বর্তমানে বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার মোট প্রতিষ্ঠান রয়েছে পাঁচটি।

এগুলো হচ্ছে ঃ ১. চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২. চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৩. চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪. সরকারী চারুকলা কলেজ, চট্টগ্রাম, ৫. খুলনা আর্ট কলেজ।

এগুলোর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীস্থ প্রতিষ্ঠানে চারুকলায় সর্বোচ্চ এমএ ডিগ্রী প্রদান করে। অন্যগুলো বি.এফ.এ পাস ডিগ্রী দিচ্ছে। এগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এফিলিয়েটেড।

পাঁচটি শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম, ব্যবস্থাপনা ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে এগুলোর ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি প্রচুর সীমাবদ্ধতা ও নিজস্ব সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। (চলবে)